‘সূত্রে মণিগণা ইব’

সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী

প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক,
দি এশিয়াটিক সোসাইটি

‘‘শিশুদের ভিতরে শ্রীভগবানের আসন পাতা। তাদের মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশি, কারণ তারা সরল ও পবিত্র। তাই তো ঠাকুর বলতেন, ‘শিশুর মতো মাকে ডাকলে মা ছুটে আসবেনই।’ ’’[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীও শিশুদের দেখতেন ‘নারায়ণভাবে’। তিনি তো সকলের মা! স্নেহ-কোমলতার প্রতিমূর্তি মায়ের সুশীতল মাতৃক্রোড়ে—নির্ভয়, নিশ্চিন্ত শান্তির আশ্রয়ে উপস্থিত কয়েকটি দেবশিশুর কাহিনি নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধ। শিশুপ্রীতির (সদ্যোজাত শিশু থেকে দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের) কয়েকটি অপার্থিব চিত্রে মায়ের কোমল-মধুর ভাব ও বাৎসল্য ফুটে উঠেছে। অবলীলায় ও নির্বিচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের ‘নারায়ণভাবে’ শিশুদের গ্রহণের আনন্দনিস্যন্দী ঘটনাগুলি ধ্যানের বস্তু।

তার আগে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা উভয়ের দিব্যসান্নিধ্যে আসা একটি বালকের কৃপালাভের ঘটনাটি দেখে নিতে পারি।

‘‘একদিনের কথা। তিন-চারি বৎসর বয়সের এক সুদর্শন শিশু আসিয়া ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিল। সম্মুখে শ্মশ্রুমণ্ডিত অপরিচিত ব্যক্তি, পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইবার জন্য মায়ের উৎসাহ; মনে ভয় ও কৌতূহল লইয়া শিশু ঠাকুরের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হয়। একে সরল শিশু, তদুপরি সচকিতভাব, বেশ লাগে ঠাকুরের; অভয় দিয়া ডাকেন,—আয়, এখানে আয়। কোন ভয় নেই, সন্দেশ খেতে দেবো।

‘‘নিকটে আসিলে ঠাকুর তাহাকে আদর করিয়া দুই হাত তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুই কাদের ছেলে রে?

‘‘আদর পাইয়া শিশু হাসে, কথা কয় না।

—নাম কি তোর, বল-না?

—শিবকালী।

—বাবার নাম বল্। কার সঙ্গে এলি এখানে?

‘‘শিশুর অসহায় চক্ষু কাহাকে অনুসন্ধান করে বাহিরের দিকে।

''ব্রজবালা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইলেন।

—ওঃ, তাই বল, তোমার খোকা বুঝি? বেশ নামটি।

''বারত্রয় উচ্চারণ করিলেন,—শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী।

''ব্রজবালা পুত্রকে বলেন,—প্রণাম করেছিস? মা ঠাকরুণ যে অত করে বলে দিলেন, বাবার পায়ে গড়াগড়ি দিতে। শিশু ভূমিতে গড়াগড়ি দেয়, ঠাকুর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন,—তোমার ছেলের সাধুর লক্ষণ, যত্ন করো ওকে। হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলেন,—খা। কিন্তু শিশুর কি হইল, খায় না, কথাও বলে না; ঠাকুরের অনুকরণে কেবল উচ্চারণ করিতে লাগিল—শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী।

''মাতাপুত্র পুনরায় নহবতে গেলে শিশুর অবস্থা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী ব্রজবালাকে বলেন,—'তোমার খোকার কাজ হয়ে গেল।' ''[২]

ঘটনাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের অভিন্নতার সুরটি ধরা পড়ে। তাঁদের অপার্থিব স্নেহধারায় স্নাত ব্রজবালার খোকাকে প্রণাম জানিয়ে আমরা শ্রীশ্রীমার 'নারায়ণভাবে' শিশুকে গ্রহণ করার নির্বাচিত পঁচিশটি চিত্রমালা দেখব।

প্রথম চিত্রে এক দুগ্ধপোষ্য তিন মাসের শিশুর কাহিনি। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। বরিশালের মাতৃআশ্রিত ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্ত্রী দীক্ষালাভের জন্য মাতৃসকাশে উপস্থিত হন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অন্তর্যামিনী মা তাঁকে দেখেই বললেন, ''তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার কোলে একটি ছেলে আছে। তাকে কার কাছে রেখে এসেছ?'' তিনি বললেন, ''খোকা এসে এ স্থান অপবিত্র করে ফেলবে, এই ভয়ে তাকে আনিনি।'' শিশু মাত্র তিন মাসের জেনে মা বললেন, ''সে কি গো, এতটুকু ছেলের মলমূত্রে ঘর অপবিত্র হয়, একথা তোমাকে কে বললে? ওরা নারায়ণের মতো। ওদের ঐরকম জ্ঞানে যত্ন করবে।''[৩] শ্রীশ্রীমা তাঁকে তখনই ফিরে যেতে বললেন, কারণ খোকা অনেকক্ষণ মায়ের দুধ না খেয়ে আছে। দীক্ষার জন্য যেদিন আসবেন সেদিন যেন খোকাকে অবশ্যই নিয়ে আসেন, একথাও মা বারবার বলে দিলেন।

ছোট্ট শিশুর জন্য মাতৃহৃদয়ের এমন সজীব চিত্র যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনই মানুষকে দেখামাত্রই মায়ের অতি সহজেই তার অন্তস্তল পর্যন্ত পড়ে নেওয়ার অলৌকিক ক্ষমতাটিও বিস্ময়কর।

দ্বিতীয় চিত্রে সাঁওতাল এক নারীশ্রমিকের সদ্যোজাত পুত্রের প্রতি স্নেহশীলা মাতাঠাকুরানির দৃষ্টান্তমূলক আচরণ—তাঁর জগন্মাতৃত্বের খানিক উন্মোচনের এক অলৌকিক দৃশ্য। মায়ের বিশেষ স্নেহভাজন রাধারানির সই সরস্বতী ঘোষের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় :

''সেসময় পৌষ মাসে ধান কাটা, ঝাড়া ও তোলার জন্য মজুরের কাজ করতে বাঁকুড়া থেকে সাঁওতালদের দল আসত।... সে বছর সাঁওতালদের দলে বেশ কিছু কামিন (মেয়ে) এসেছিল। মঙ্গলা, গঙ্গা, দুলা...। মঙ্গলা ছিল গর্ভবতী। ধান ঝাড়ার ব্যস্ততার মধ্যে তার প্রসবযন্ত্রণা ওঠে এবং এক শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পিসিমা [শ্রীশ্রীমা] তখন জয়রামবাটীতে। এই ঘটনা শুনে তিনি একটা ছেঁড়া কাপড় সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলার সঙ্গে দেখা করে বাচ্চাটাকে শোয়ানোর জন্য কাপড়টা দিলেন।... পিসিমা রোজ তাকে দেখতে যেতেন। তাদের যখন বাড়ি ফেরার সময় হল মঙ্গলা তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে এল। পিসিমা সেই ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। মঙ্গলাকে একটা টাকা দিয়েছিলেন। এমনকি বাচ্চাটা যাতে শীতে কষ্ট না পায় তাঁর নিজের গায়ের চাদরটাও খুলে তাদের দিয়েছিলেন।''[৪]

সেদিনের বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাস করা সত্ত্বেও মায়ের এই জাতপাতের ঊর্ধ্বে অবস্থান সত্যিই অবিস্মরণীয়। তেমনই স্মরণীয় জগন্মাতার স্নেহচাদরে আবৃত সাঁওতাল রমণীর সদ্যোজাত শিশুর সৌভাগ্যলাভের কাহিনিটি।

তৃতীয় চিত্র। বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সুহাসিনী দেবী ছিলেন শ্রীশ্রীমার স্নেহধন্যা সরলা দেবীর বাল্যবন্ধু। তিনি যমজ কন্যার বিয়োগব্যথায় পাগলিনীপ্রায় হয়ে পড়লে সরলা দেবী তাঁকে শোকনাশিনী মায়ের কাছে নিয়ে আসেন। মা সমব্যথী হয়ে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। করুণাময়ী মায়ের স্নেহমাখা প্রাণজুড়ানো কথা ও স্পর্শে, ঐশী সান্নিধ্যে সুহাসিনীর দুঃখ অনেকাংশে লাঘব হয়। মায়ের আশীর্বাদে একটি পুত্রও হয় তাঁর। সুহাসিনী আনন্দে আত্মহারা। কিছুদিন পর তিনি নবজাতককে নিয়ে মাতৃদর্শনে এলে মা বললেন, ''এতদিন আসনি কেন গো?'' সুহাসিনী তাঁর শিশুপুত্রকে মার পায়ের কাছে রেখে বললেন, ''এই যে মা—ছেলে হয়েছে বলে। একে আপনার পায়ের ধুলো দিন।'' মা বললেন, ''আহা, বাছাকে মাটিতে শোয়াচ্ছ কেন? দাও আমার কোলে দাও।'' স্নেহবিগলিতচিত্তে মা শিশুটিকে কোলে নিয়ে বললেন, ''বাঃ, বেশ ছেলে।'' তারপর শিশুকে আশীর্বাদ করলেন। সুহাসিনী মুগ্ধ বিস্ময়ে তা দেখেন।[৫] সদ্যোজাত শিশুর প্রতি জগজ্জননীর স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ও করুণার দৃশ্যটি আজও আমরা সুহাসিনী দেবীর মতোই মুগ্ধ বিস্ময়ে কল্পনায় দেখার চেষ্টা করি।

শিশু-নারায়ণের সেবার চতুর্থ চিত্র। বাগবাজারে মায়ের বাড়ির সামনের মাঠের শ্রমিক-বস্তি থেকে একটি মেয়ে তার রুগ্‌ণ শিশুটিকে কোলে করে এসেছে। তার প্রতি মায়ের কত দয়া ও সহানুভূতি। মা আশীর্বাদ করলেন—''ভাল হবে।'' দুটি বড় বেদানা ও কতকগুলি আঙুর ঠাকুরের প্রসাদী করে তাকে দিয়ে বললেন, ''তোমার রোগা ছেলেকে খেতে দিও।'' দরিদ্র জননীর আনন্দ ধরে না। কৃতজ্ঞতায় বারবার সে মাকে প্রণাম করতে লাগল।[৬]

জাতপাতনির্বিশেষে মায়ের শিশুপ্রীতির অনুপম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় পঞ্চম চিত্রটিতে। মায়ের পালকি-বেহারাদের সর্দার যোগেন্দ্র দাস অর্থাৎ 'যোগে দুলে'-র পুত্র শান্তিরাম আশৈশব মায়ের স্নেহধন্য। তাদের বাড়ি ছিল জয়রামবাটীর পাশের গ্রাম হলদি পুকুরিয়াতে। শান্তিরামের অন্নপ্রাশন হয়েছিল অন্নপূর্ণা শ্রীসারদা দেবীর শ্রীহস্তে দুধভাত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। অতি বিশ্বস্ত ও স্নেহাস্পদ যোগে দুলের পালকিতে মা যাতায়াত করেছেন বহুবার। জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে তিনি প্রায়ই আসতেন—মায়ের ফাইফরমাশ খেটে গৌরব বোধ করতেন। সঙ্গে শিশুপুত্র শান্তি। বাবার দেখাদেখি মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ত, ধুলোয় গড়াগড়ি দিত। মায়ের কাছছাড়া হত না; যতক্ষণ না মা তাকে মুড়ি বা মিষ্টি কিছু দিতেন। মা রুপোর বালা গড়িয়ে শিশুর দুহাতে স্বয়ং পরিয়ে দিয়েছিলেন। সে-বালা আজও শান্তির ঘরে পরম যত্নে তোলা আছে। যেমন ধাতুময় দেববিগ্রহ নিত্য পূজিত হন, ওই বালা জোড়াও শান্তির দরিদ্রকুটিরে তেমনই অর্চিত হয়ে থাকে। পরিবারের সকলের বিশ্বাস—ওই বালাজোড়াই ঘরের লক্ষ্মী—লক্ষ্মীস্বরূপা মা সারদারই উপস্থিতি গৃহের কল্যাণের জন্য।[৭]

শান্তিরামের কথায় : ''আমার জন্মের দু-তিন মাস পর পিসিমা বাবাকে একদিন বললেন : 'যোগীন, মুখেভাতের দিন তোর ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আমি তোর ছেলেকে প্রসাদ খাইয়ে দেব।'... মুখেভাতের দিন সকালে বাবা-মা আমাকে কোলে করে পিসিমার বাড়িতে নিয়ে আসে। পিসিমা রাধু-দির বাটিতে দুধ-ভাত মেখে নিজে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন পিসিমা আমাকে একজোড়া রুপোর বালাও দিয়েছিলেন।

বালাজোড়া আজও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ... পিসিমার আশীর্বাদের স্মৃতি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ, তাই যক্ষের ধনের মতো বালা-জোড়াকে আগলে রেখেছি। রোজ মাথায় ঠেকাই।"[৮]

ধন্য শান্তিরাম! শৈশব থেকে মাতৃস্নেহধারায় স্নাত শান্তি দরিদ্র হয়েও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ঘুরে বেড়াননি—চাষ-আবাদও করেননি। সারাজীবন হয়ে থেকেছেন মাতৃমন্দিরের 'অশুল্ক ভৃত্য'—মায়ের আশ্রম নিত্য ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতেন।

ষষ্ঠ চিত্রটিতেও আর এক শিশুনারায়ণের অন্নপ্রাশনের কথা। প্রবোধবাবুর কথায় : ''আমাদের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখে নিজের প্রসাদ দিয়াছিলেন। বিকালে যখন সকলে তাঁহার কাছে বসিয়াছি মা বলিলেন, অন্নপ্রাশন তো হল বাবা, হল কিন্তু রবিবারে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রবিবারে হলে কী হয় মা? মা বলিলেন, আর কিছু হয় না, একটু গরীব হয়। তারপর প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, বামুনের ছেলে—একটু বৈদিক কার্য কত্তে হয়, সংস্কার কিনা, বাড়ীতে গিয়ে একটু ঘি পুড়িয়ো।' "[৯]

এক্ষেত্রে শিশুর মুখে প্রসাদী অন্ন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা তার ভবিষ্যৎ চিন্তায় ভাবিত হয়ে বার-নক্ষত্র ও সামাজিক শ্রেণীবিভাজন অনুযায়ী বৈদিক কাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সপ্তম চিত্র। একদিন সুহাসিনী দেবী তাঁর শিশুকন্যা শান্তিকে না নিয়ে মায়ের কাছে এলে, মা বলেছিলেন, ''এস, এস। আজ যে মেয়েকে নিয়ে আসনি? ওরা সব ভাল আছে তো?"

সুহাসিনী দেবী বলেন, ''হ্যাঁ মা, সবাই ভাল আছে। মেয়েকে আনলে বড় জ্বালাতন করে আপনাকে। অতিষ্ঠ করে তোলে সবাইকে। তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়। তাই আজ ওকে রেখে এসেছি।" মা হেসে বললেন, ''কই, আমি তো বাপু বুঝতে পারি না আমাকে বিরক্ত করে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটু দুষ্টুমি তো করবেই।"[১০]

সর্বংসহা সদানন্দময়ী বিশ্বজননী এভাবেই হাসিমুখে শিশুদের গ্রহণ করতেন। সস্নেহ ভালবাসা দিয়ে তাদের ভরিয়ে তুলতেন, তাদের শিশুসুলভ দুষ্টুমি আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতেন।

অষ্টম চিত্র। মাতৃআশ্রিত, মায়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত চন্দ্রমোহন দত্তের স্ত্রী চপলাসুন্দরী দেবী তাঁর বড় ছেলে অমূল্যের ভয়ানক দুষ্টুমির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মাকে অনুরোধ করেছিলেন মা যেন তাকে একটু শান্ত করে দেন। মা হেসে বলেছিলেন, ''বৌমার কথা শোন! ছোট ছেলে দুষ্টুমি করবে না তো কি গোবরগণেশ হয়ে মায়ের আঁচলে সেঁধিয়ে থাকবে? বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ও নিয়ে ভেব না।"

চপলাসুন্দরী বলেন, ''ওকে বড় করে তোলাই তো এখন দায় হয়ে উঠেছে। যখন-তখন রাস্তায় চলে যায়, পুকুরে নেমে দাপাদাপি করে। ভয় হয় গাড়ি চাপা না পড়ে—জলে না ডুবে যায়! আপনি দয়া করে কিছু একটা করে দিন, যাতে ওর দুষ্টুমি কমে।" মা হেসে অমূল্যকে কাছে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বলেন, ''বৌমা, তোমার অমূল্য আর আগের মতো দুষ্টুমি করবে না।" আশ্চর্য ব্যাপার, অমূল্য তারপর থেকে শান্ত হয়ে গেল! যখন-তখন রাস্তায় বেরনো, পুকুরে দাপাদাপি এরপর থেকে আর দেখা যায়নি।[১১]

মায়ের অনন্ত লীলা, ছোট্ট শিশুর কল্যাণে শিষ্যার বিচিত্র প্রার্থনা মা অনায়াসে সহাস্যে পূরণ করতে একটুও ইতস্তত করেননি।

নবম চিত্রে দেখা যায়, সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে আড়াই বছরের একটি শিশুপুত্রের জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাওয়া ও মায়ের অভয়স্পর্শে কান্না থামার এক আশ্চর্য কাহিনি।

ঢাকার মুন্সিগঞ্জ জেলার (বিক্রমপুর) অন্তর্গত

ভরাকর গ্রামের খ্যাতনামা কবিরাজ দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী রাজবালা দেবী ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত। সন্তানহীনা রাজবালা মায়ের কৃপায় পুত্রসন্তান লাভ করে, আড়াই বছরের পুত্রকে নিয়ে বাগবাজারে মায়ের কাছে আসেন।

পুত্রকে দেখে মা খুব খুশি হন ও আশীর্বাদ করেন। রাজবালা দেবী যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ছোট্ট ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পড়ে যায়, তার মাথায় আঘাত লাগে। কিছু রক্তপাতও হয়। রাজবালা শিশুর কান্না থামানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু কান্না আর থামে না।

তখন শ্রীশ্রীমা শিশুটিকে নিজের কোলে নিয়ে আদর করতে থাকেন। তাতে সে একেবারে শান্ত হয়ে যায়। মাতৃ-অঙ্কশায়ী শিশু তার অনুভবসামর্থ্য অনুযায়ী হয়তো এইটুকু বুঝতে পারে যে, তার ব্যথার নিরসন, ভয়ের মোচন—তার সমস্ত প্রাপ্তি—একমাত্র মায়ের কাছে।

এভাবেই দেখা যায়, শিশুরূপী নারায়ণদের কখনও স্নেহচুম্বন, কখনও কোলে তুলে নেওয়া, আবার কখনও বক্ষে জড়িয়ে ধরা—এই ছিল মাতৃলীলা-বিলাস।

দশম চিত্র। যশোরের নড়াইল জেলার কালিয়া গ্রাম থেকে কুন্তলিনী দাশগুপ্ত এসেছেন মায়ের বাড়িতে। উদ্দেশ্য মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ। সঙ্গে তাঁর স্বামী মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত (যিনি বছর দুই পূর্বেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছেন), তাঁদের তিন বছরের শিশুপুত্র ও কুন্তলিনী দেবীর দাদা। দাদার কাছে ছেলেকে রেখে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মায়ের বাড়িতে প্রবেশ করলেন।

দীক্ষাপর্ব মিটে যাওয়ার পর প্রণাম শুরু হলে পুরুষ-ভক্তেরা প্রথম প্রণাম করতে এলেন। তাঁরা চলে গেলে, কুন্তলিনী দেবীর কথায় : ''মার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতেই অবাক হয়ে দেখলাম যে, ঐ দরজার সামনেই মা আমার ছেলেটিকে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন। ছেলেটি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'মা, সাদা মা?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সাদা মা।' তখন মাকু প্রভৃতিও সেখানে এলে মা তাদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'আহা, বেশ ছেলেটি গো, বেশ ছেলেটি!' তারপর তিনি ছেলেটিকে একটি সন্দেশ খেতে দিলেন। আমি মাকে তা প্রসাদ করে দিতে বললে মা তা পূর্বের ন্যায় জিবে ঠেকিয়ে দিলেন। পরে স্বামীর কাছে শুনেছি যে, তিনি যখন মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, তখন মা নিজ হতেই ছেলেটিকে দেখতে চাওয়ায় তিনি তাকে মার কাছে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু আমরা কেউই ছেলের বিষয় পূর্বে মাকে বলিনি।''[১২]

অন্তর্যামী মায়ের দিব্যদৃষ্টি, অযাচিত শিশুপ্রীতি ও মায়ের কৃপাকাহিনি সত্যিই ছিল হতবাক করার মতো।

শিশুদের প্রতি মায়ের আন্তরিক ভালবাসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ একাদশতম ঘটনাটি। আরামবাগের প্রভাকর মুখোপাধ্যায় জয়রামবাটীতে এসেছেন। কথায় কথায় মায়ের কর্ণগোচর করে ফেলেছেন, বাড়িতে তাঁর ছেলের হাম হয়েছে। ফেরার সময় প্রভাকরবাবু মাকে প্রণাম করলে মা বললেন, ফেরার পথে কামারপুকুর হয়ে যেতে এবং সেখানে শীতলাদেবীর পূজা দিয়ে ঘরে ফিরতে। শুধু বলা নয়, নিজের আঁচল থেকে একটি টাকাও দিয়ে দিলেন প্রভাকরবাবুর হাতে। কেউ জানল না, কেউ দেখল না। আর্তিহন্ত্রী সারদার করুণাধারা নীরবেই বয়ে চলেছিল—এখনও তেমনই বইছে।[১৩]

অনুরূপ সুষমামণ্ডিত আর একটি স্মৃতিকথা পাই মাতৃপদাশ্রিত শ্রীশচন্দ্র মতিলালের স্ত্রী ধরাসুন্দরী দেবীর অবিস্মরণীয় কাহিনি থেকে।

একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নামলেন এক অভিজাত পরিবারের বধূমাতা। তিনি মাঝে

মাঝেই আসেন শ্রীশ্রীমার কাছে। তাঁর স্বামীও নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন মায়ের বাড়িতে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মায়ের দীক্ষিত সন্তান।

বধূটি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই মা ঘরে ঢুকে ঠাকুরের চরণামৃত ও প্রসাদি ফুল এনে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ''এ দুটি নাও বউমা। এ নিয়ে এখনই বাড়ি ফিরে যাও।'' বধূ হতচকিত। এরকম তো কখনও ঘটেনি। প্রতিবারেই এসে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে, মায়ের কাছে বসে মায়ের মুখে কত কথা শোনেন। আজ তবে এমন ঘটল কেন? তিনি কি কোনও অপরাধ করেছেন? এমনই নানা কথা সারা পথ ভাবতে ভাবতে, কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণমনে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

বাড়ি ফিরে দেখলেন সকলেই উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। কারণ তাঁর বছর আড়াই বয়সের শিশুপুত্রটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার দেখে গেছেন। সে বিছানায় নেতিয়ে শুয়ে আছে।

মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বধূ মনে মনে বললেন, ''মাগো! তোমার কী করুণা! ছেলের অসুখের জন্যই আজ তুমি আমায় ফিরে আসতে বলছিলে!'' মায়ের আশীর্বাদপুষ্ট এই শিশুর নাম যামিনীমোহন মতিলাল।

অন্তর্যামী মা শিশুর অসুস্থতা জেনে চরণামৃত ও প্রসাদি ফুল দিয়ে অত্যাশ্চর্যভাবে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। পরবর্তী কালে যামিনীমোহনকে কেউ দীক্ষার কথা বললে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, ''আমি শ্রীশ্রীমা-র কোলে বসেছি; আমার আবার দীক্ষা কী? আমার মতো ভাগ্যবান কজন?''[১৪]

ত্রয়োদশতম চিত্রটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে স্বল্পায়ু গিরিশ-তনয়ের মাতৃসান্নিধ্যলাভের প্রসঙ্গ।

গিরিশচন্দ্র তাঁর শিশুপুত্রকে দেবতাজ্ঞানে পালন করতেন। ছেলেটির স্বভাব অতি মধুর ছিল। গিরিশ-গৃহে আগত সকলেই শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং একবার অন্তত তাকে কোলে নিয়ে মুখচুম্বন করতেন। শ্রীশ্রীমা কখনও গিরিশ-ভবনে এলে শিশু তাঁর কোলে বসে আনন্দ প্রকাশ করত। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে মা যখন বরাহনগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে ছিলেন, তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের আগ্রহে মহাকবি সপুত্র শ্রীমাকে দর্শন করতে যান।

শিশুটির বয়স তখন তিন বছর। কিন্তু তখনও সে কথা বলতে পারত না—হাবভাবে সব জানাত। সেদিন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে সে শ্রীমাকে দেখার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হল। আগেও মাকে সে দেখেছে, কিন্তু গিরিশবাবু দেখেননি। কথা না বলতে পারলেও সে অস্থির হয়ে, মা ওপরে যেখানে ছিলেন সেদিকে দেখিয়ে 'উঃ উঃ' করতে লাগল। প্রথম কেউ বুঝতে পারেননি; পরে বুঝতে পেরে জনৈক সেবক তাকে উপরে মায়ের কাছে নিয়ে গেলে সে মায়ের চরণে পড়ে প্রণাম করল। তারপর নিচে নেমে সে গিরিশবাবুকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাত ধরে টানতে থাকল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে বললেন, ''ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি—আমি যে মহাপাপী।'' বালক কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না, তখন তাকে কোলে করে গিরিশচন্দ্র কম্পিত কলেবরে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উপরে গিয়ে শ্রীমায়ের পায়ে পড়ে বললেন, ''মা, এ হতেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হলো আমার।'' শিশুটি মাত্র তিন বছর বয়সেই দেহত্যাগ করে।[১৫]

মাতৃসান্নিধ্যে তাপসী দুর্গাপুরী দেবীর শৈশবে ঘটে যাওয়া মনোরম চতুর্দশতম প্রসঙ্গটি এইরকম :

মায়ের এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। আবালবৃদ্ধ যে-কেউ একবার তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে, তাঁর অহেতুক স্নেহ ও আকর্ষণ জীবনে ভুলতে পারেনি। দক্ষিণ কলকাতার এক ব্রাহ্মণকন্যা [দুর্গাপুরী দেবী] শৈশব থেকেই মায়ের দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে। আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে

যখন-তখন সে মায়ের বাড়িতে চলে আসত তাঁর দর্শনের জন্য। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে রাত্রিবাসও করত। মাও তাকে খুবই স্নেহ করতেন।

একদিন রাত্রে মেয়েটিকে তার মাতামহী ঠাকুরদেবতার গল্প বলতে গিয়ে বলেন, ভক্তি হলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। ভক্তি যে কী বস্তু, সে-জ্ঞান তখনও ছোট মেয়েটির হয়নি। তাই সে প্রশ্ন করল, ''ভক্তি কোথায় পাওয়া যায় দিদিমা?'' ''সেই যে পরমহংস মশায়ের পরিবার, তাঁর কাছে আছে। তিনি ভক্তি দিতে পারেন।'' সরলমনা কন্যার মনে কৌতূহল জাগে; বস্তুটি তাকে পেতেই হবে।

পরদিন সে তার মেজদিদিকে ধরে বসল, ''সেই মায়ের কাছে নিয়ে চলো, ভক্তি আনতে হবে।'' কথা শুনে তিনি তো প্রথমে খুব হাসতে লাগলেন, পরে ছোট মেয়েটির আবদার মেনে তাকে নিয়ে চললেন মায়ের কাছে। মাকে তিনিও খুব ভক্তি করতেন, ভাবলেন, এই উপলক্ষ্যে তাঁরও মাতৃদর্শন হবে। দুজনে ভবানীপুর থেকে বোসপাড়া লেনে মায়ের বাড়িতে এলেন। মা তখন সবেমাত্র ঠাকুরঘর থেকে বাইরে এসেছেন, ছোট মেয়েটি প্রণাম করতেও ভুলে গেল, ছুট্টে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে বলল, ''তোমার কাছে নাকি ভক্তি আছে, আমায় দাও।''

শ্রীশ্রীমা হেসে বললেন, ''ওমা এ খুদেভক্ত বলে কি গো! আমার কাছে যে ভক্তি আছে, কে বলেছে তোমায়?''

''দিদিমা যে বললে, তোমার কাছে আছে।''

গিরিশচন্দ্রের ভগ্নী ন-দিদি এবং যোগেনমার গর্ভধারিণী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও তাকে খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন, ''শক্ত করে ধরো খুকি, মা-ঠাকরুনের কাছেই ভক্তি আছে।'' শুনে মায়ের আঁচল সে আরও শক্ত করে ধরে একেবারে মায়ের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

''আচ্ছা, দাঁড়া বাপু, এনে দিচ্ছি;''—বলে মা ঠাকুরঘর থেকে একটি প্রসাদি অমৃতি এনে তার হাতে দিলেন। ভক্তি-প্রাপ্তির কাহিনি ততক্ষণে প্রচার হয়ে গেছে। অনেকে এসে ছোট্ট মেয়েটিকে ঘিরে ধরল; ভক্তির জন্য সকলেই হাত পাতল। এ বলে—দিদি আমায় একটু দাও, ও বলে—খুকি আমায় একটু দাও। মা-ঠাকরুন তোমায় ভক্তি দিয়েছেন, আমাদের সবাইকে ভাগ করে দিতে হবে। এই অবস্থার জন্য মেয়েটি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সকলকে কিছু কিছু ভাগ দিয়ে নিজে একটু নিয়ে অবশিষ্ট অংশ সে রেখে দিল।[১৬]

এভাবেই সরল নিষ্পাপ শিশুটি পেয়েছিল মায়ের স্নেহের দান, আদরের উপহার। এই উপহারই তো মায়ের সহজ কৃপা—সন্তানের প্রতি।

সারদা-করুণাধারার আর একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা। মায়ের কৃপা-কাহিনির পঞ্চদশতম চিত্র। ''জনৈকা বালিকা তাহার গর্ভধারিণীর সহিত মাতাঠাকুরানির দর্শনে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। একদিন মা তাহাকে পরম স্নেহভরে বলেন,—'এসো মা, তোমায় আজ আমি দীক্ষা দেব।' ''

''মাতাঠাকুরাণী এইরূপে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কন্যাকে দীক্ষা দিবেন, কন্যার এই সৌভাগ্যে তাঁহার গর্ভধারিণী নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। গঙ্গাস্নানান্তে সিক্তবসনে আসিয়া কন্যা মায়ের নিকট উপবেশন করিলেন। মাতাঠাকুরাণীর দিব্যভাব এবং আকর্ষণে বালিকার সরল পবিত্র হৃদয়ে এক অভাবনীয় প্রেরণা ও আনন্দের সঞ্চার হইল।

''দীক্ষা হইয়া গেলে মা তাঁহাকে বলিলেন, —'তোমাকে আজ যা দিলুম মা, এ সন্ন্যাসের মন্ত্র। তোমার মৃত্যুর পূর্বে এ-মন্ত্র কারুর কানে দিয়ে যেও; তুমি না হলেও সে সন্নিসী হবে।'

''যথাকালে এই বালিকা সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক পথেও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। সময় সময় তাঁহার

মনে এমন উচ্চভাবের উদয় হইত যে, স্বামী, সংসার, ধনসম্পদ সকলই অকিঞ্চিৎকর এবং দুর্ব্বহ বোধ হইত, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া উদাসিনী হইয়া যাইবার তীব্র প্রেরণা তিনি অনুভব করিতেন। কিন্তু নিয়তি তাহা হইতে দেয় নাই।

''তারপর একদিন—

''এই ভক্তিমতী নারী যেন মন্ত্রশক্তির অদম্য প্রভাবেই নিজের পুত্রকে মাতাঠাকুরাণী-প্রদত্ত সেই অমোঘ মন্ত্র দান করিয়া ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন,—'বাবা, আমার গুরুর আদেশ, এই মন্ত্র কাউকে দিয়ে যেতে হবে। মন্ত্র তাকে সন্যিসী করবে। যা এতদিন আমি বুকের মধ্যে যখের ধনের মত আগলে রেখেছিলুম, আজ তোমায় দান করলুম। তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি,—তাঁর বীজ তোমাতে সফল হোক।'

''ধন্য ভারতীয় নারী, মানসিক দৃঢ়তা, ঐশ্বর্যের মধ্যেও ভোগে অনাসক্তি এবং সুদুর্লভ পরমধনের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ যাঁহাদের চরিত্র মহিমান্বিত করিয়াছে। ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, শ্রদ্ধায় অন্তর ভরিয়া ওঠে।

''আর ধন্য মাতা সারদামণি, এই ভোগবাদের যুগেও যাঁহার অমোঘ মন্ত্রশক্তি ঐশ্বর্যশালিনী কুলবধূকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে ত্যাগের পথে, মমতাময়ী জননীকেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিতে।''[১৭]

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

১। সম্পাদনা ও সংকলন : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে*, খণ্ড ৩, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ৬৮২ [এরপর, *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে*]

২। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, *সারদা-রামকৃষ্ণ*, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃঃ ১২৯-৩০ [এরপর, *সারদা-রামকৃষ্ণ*]

৩। দ্রঃ *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (অখণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃঃ ৩৩৩

৪। দ্রঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *নবযুগের দিশারী শ্রীশ্রীমা সারদা*, দেবসাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩৬২ [এরপর, *নবযুগের দিশারী*]

৫। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭৯

৬। দ্রঃ স্বামী অপূর্বানন্দ, *জননী সারদাদেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৮, পৃঃ ১৫৬

৭। দ্রঃ স্বামী অজ্ঞজানন্দ, *প্রকৃতিং পরমাম্ :* (শ্রীশ্রীমাসারদার চরিতানুধ্যান), অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২৩, পৃঃ ১৬৯-৭১

৮। *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে*, খণ্ড ৩, ২০১১, পৃঃ ৬৯৭

৯। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *শ্রীশ্রীসারদাদেবী*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৪২২, পৃঃ ২২৩

১০। *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে*, খণ্ড ৩, ১৯৯৭, পৃঃ ৬৮০

১১। দ্রঃ *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে*, খণ্ড ১, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃঃ ১৩৯

১২। সম্পাদনা : স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ, *বাংলাদেশে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শিষ্যবৃন্দ ও তাঁদের স্মৃতিমালা*, ঢাকা, রামকৃষ্ণ মঠ, ২০০৪, পৃঃ ৬২-৬৩

১৩। *প্রকৃতিং পরমাম্ (শ্রীশ্রীমাসারদার চরিতানুধ্যান)*, পৃঃ ১৪৭

১৪। *নবযুগের দিশারী*, পৃঃ ৬৩

১৫। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদাদেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪, পৃঃ ১৬৮-৬৯

১৬। দ্রঃ *সারদা-রামকৃষ্ণ*, পৃঃ ১৬৬-৬৭

১৭। তদেব, পৃঃ ১৩৬-৩৭